বাজেটকে কিভাবে দরিদ্রমুখী করা যায়?

আহসান মোহাম্মদ

বাজেট নিয়ে সচেতনতা বাড়ছে। জুনে বাজেট পেশ করা হলেও গত কয়েক বছর ধরে বাজেট নিয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে চার-পাঁচ মাস আগে থেকে। তাতে সরকারের পক্ষে নাগরিকদের বিভিন্ন অংশের প্রত্যাশা, প্রস্তাব, পরামর্শ ইত্যাদি জানা এবং তা বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে সংসদে বাজেট পেশের কয়েকদিন আগে-পরে যে আলোচনা হয় তাতে চায়ের কাপে ঝড় তোলা গেলেও বাজেটে তেমন প্রভাব ফেলা যায় না। কেননা, বাজেট তৈরীর দীর্ঘ প্রক্রিয়া পার করে প্রস্তাবিত বাজেটকে পরিবর্তন করা শেষ মুহূর্তে সম্ভব হয় না। এ বছরের বাজেট কয়েকটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক চাপ, অঙ্গীকার ও প্রত্যাশা না থাকার কারণে জনতুষ্টি ও অপচয়মূলক খাতগুলোকে যথাসম্ভব পরিহার করে এ বাজেটে দারিদ্র বিমোচন ও প্রকৃত উন্নয়নমূলক খাতগুলোকে অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া যাবে। অপরদিকে বাজেটটি এমন এক সময়ে তৈরী হচ্ছে যখন সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা হুমকীর মুখে। গত কয়েক বছরের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর এ ধরণের পরিস্থিতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই মারাত্মক পরিণতি নিয়ে আসতে পারে যা দারিদ্র বিমোচনে অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে গত এক যুগেরও বেশী সময় ধরে যে সকল বাজেট বাস্তবায়ন হয়েছে তাদের সকলের ঘোষিত অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র বিমোচন। এ লক্ষ্য যে বাস্তবায়িত হয় নি তা নয়। নব্বই এর দশকে বাংলাদেশে বছরে দারিদ্রমুক্তির হার ছিল শতকরা এক শতাংশ যা বর্তমান দশকে দুই শতাংশে উপনীত হয়েছে। এর পিছনে সরকারের বাজেট একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্রমুক্তির পাশাপাশি সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বেড়ে চলেছে এবং হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও বাড়ছে। দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি এ বিষয়টিকেও বাজেট প্রণয়ণের সময় মাথায় রাখতে হবে। বাজেটকে কার্যকরভাবে দারিদ্রমুখী করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে আমাদের দেশে দারিদ্রের মূল কারণগুলো কি কি। তারপর দেখতে হবে সে কারণগুলি দূর করে দারিদ্রের শিকল ভাঙ্গতে হলে বাজেটে কি ধরণের ব্যবস্থা থাকতে পারে।

১. দারিদ্র নামক বিষচক্রের প্রধান উপাদান হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতির ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সব থেকে বেশী শোষিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বড় বড় দুর্নীতিগুলোতে শোষণ হয় কিছুটা পরোক্ষভাবে এবং ছোট আকারের দুর্নীতিগুলোতে এ শোষণ হয়ে থাকে প্রত্যক্ষ। যেমন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে গিয়ে যদি কয়েক শত কোটি টাকার দুর্নীতি হয়, তাহলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাতে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হলেও পরোক্ষভাবে হয়ে থাকে। তাদের করের টাকা থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ পাবার কথা তা পাওয়া যায় না। বেশ কয়েক বছর ধরে আরেক ধরণের দুর্নীতি বহুল আলোচিত হয়ে আসছে। বর্তমান ও বিগত সরকারসমূহ দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির পিছনে ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটকে দায়ী করে আসছে। কিছু ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আটকে রেখে দ্রব্য মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। এই বর্ধিত মূল্য দেশের সাধারণ মানুষকে পরিশোধ করতে হয়। তাদের বড় অংশ দরিদ্র। এ ধরণের প্ররোক্ষ চাদাবাজির ফলে সমাজের নিম্নবিত্তরা ক্ষতিগ্রস্থ হয় সব থেকে বেশী। কেননা যে দ্রব্যটি ২০ টাকা দিয়ে কিনতে পারার কথা, তার জন্য তাকে ৩০-৪০ টাকা ব্যয় করতে হয়। অপরদিকে দ্রব্যমূল্য কমাতে গিয়ে আমদানি শুল্ক

কমিয়ে সরকার রাজস্ব হারায়। সে ক্ষতি পোষাতে কর বাড়ানো হয়। তারপরও দ্রব্যমূল্য না কমার কারণে সিন্ডিকেট আরও বেশী লাভবান হয়ে থাকে। দরিদ্ররা দুর্নীতির ফলে শোষিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হলেও যে যত ধনী ও শক্তিশালী দুর্নীতি থেকে তার পরোক্ষ লাভ ততো বেশী। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থের একটি অংশ অর্থনীতিতে ফিরে আসে। সে অর্থে যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় বা বিলাস সামগ্রীর বিক্রয় বৃদ্ধি ঘটে তার সিংহভাগ যায় সমাজের উপর তলার মানুষের কাছে। ফলে দুর্নীতি থেকে দরিদ্ররা কেবল ক্ষতিগ্রস্থই হয়; অপরদিকে সমাজের সচ্ছল অংশ তার কিছু ভাগ পেয়ে থাকে। এবার দেখা যাক প্রত্যক্ষ দুর্নীতির বিষয়টি। অধিকাংশ সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য ঘুষ দেয়াটি নিয়মে পরিণত হয়েছে। এর ফলে দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সবথেকে বেশী। ঘুষ না দিতে পারার কারণে তারা যোগ্যতা সত্তেও চাকুরী পাচ্ছে না। অপরদিকে ঘুষ দিয়ে যারা চাকুরী পেয়েছে তারা তাদের ঘুষের টাকা তুলতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে বেশী করে হয়রানি করে এবং তাদের নিকট থেকে বেশী পরিমাণে ঘুষ নেয়। এ ধরণের ঘুষের পরিমাণ আবার দরিদ্রের জন্য বেশী। থানায় কোন অভিযোগ করতে গেলে অভিযোগকারী যদি বিত্ত ও প্রভাবশালী হয়, তাহলে তাকে অনেকক্ষেত্রে ঘুষ দিতে হয় না। কিন্তু একজন দরিদ্র ব্যক্তি অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত যাই হোক না কেন, তাকে ঘুষ দিতে হয়। এভাবে দুর্নীতির ফলে একদিকে যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধিকতর শোষণের শিকার হয়, তেমনি তাদের অর্থনৈতিক বিকাশের পথও কঠিনতর হয়ে পড়ে।

এ কারণে দারিদ্র বিমোচন করতে হলে দুর্নীতি দূরীকরণের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলোকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাজেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের আয়কর ব্যবস্থা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে উৎসাহিত করে। পূর্ববর্তী একটি নিবন্ধে দেখানো হয়েছিল, কেউ বৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে ও নিয়মিত কর দিয়ে এপার্টমেন্ট কিনতে গেলে সরকারকে যে পরিমাণ কর দিতে হয় তা দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত কালো টাকার ক্ষেত্রে প্রদেয় করের ৩০ গুণেরও বেশী। এ ধরণের ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ না হলে সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান তেমন কোন কাজে আসবে না। অপরদিকে যে সকল প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তাদেরকে পর্যাপ্ত জনবল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন, কর বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের মত প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যপক প্রচলন করতে হবে। তাছাড়া দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধিও বটে। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কথা সকল মহল থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে। আগামী বাজেটে এ বিষয়ে একটি প্রকল্প নেয়া প্রয়োজন। এ প্রকল্পের আওতায় প্রচার মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করা যেতে পারে। পাঠ্য পুস্তকে এ বিষয়ে প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত করলে ছোটবেলা থেকে শিশুরা দুর্নীতিকে ঘৃণা করতে শিখবে। মসজিদের ইমাম ও আলেমগণ যেন তাদের ওয়াজ ও বক্তৃতায় এ বিষয়ে কথা বলেন সে জন্য বিশেষ সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও এই প্রকল্প থেকে করা যেতে পারে।

২. আমাদের অর্থনীতির অবস্থা হচ্ছে উচ্চরক্তচাপগ্রস্থ ব্যক্তির মত। তার শরীরে যে রক্তের অভাব রয়েছে তা নয়। কিন্তু সে রক্ত দেশের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়ে কোষে কোষে পুষ্টি যোগাতে পারছে না; কেননা একদিকে পুষ্টি প্রবাহের শিরাগুলো ঐতিহ্যগতভাবে সংকীর্ণ, অপরদিকে পুজিবাদের মেদ জমে তার নাব্যতা আরও কমে গেছে। আমাদের অর্থনীতি ভৌগলিক ও শ্রেণীগতভাবে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। বলা হয়ে থাকে ঢাকার বাইরে ফাঁকা। রাজধানীর বাইরে একমাত্র চট্টগ্রাম ছাড়া অন্য বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শহরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ অতি সীমিত। সকল অর্থনৈতিক

কর্মকান্ড রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে গ্রামীন জনগোষ্ঠী, যাদের অধিকাংশ দরিদ্র, তারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফল তেমন পাচ্ছে না। গ্রাম বা মফঃস্বল শহরের একজন তরুণ বা তরুণীর জন্য রাজধানীতে এসে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করা অনেকটাই অসম্ভব। আরও বেশী অসম্ভব রাজধানীতে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা। রাজধানী অতিমাত্রায় ঘনবসতিপূর্ণ হওয়া এবং সচ্ছলদের অধিকাংশের এখানে বসবাস হবার কারণে ক্রয়-বিক্রয়ের সিংহভাগ সংঘটিত হচ্ছে এস্থানে। তার ফলে ভৌগলিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। একজন প্রান্তিক কৃষক যে মূল্যে তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে তার বহুগুণ বেশী দামে রাজধানীর ভোক্তারা তা কিনে থাকে। তাদের ব্যবসার সুযোগও সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যদি কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পর্যাপ্ত সুবিধা থাকতো, তাহলে ঢাকার দেড় কোটি অধিবাসীর মধ্যে অন্ততঃ এক কোটি জনগণ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শহরে বাস করতো। তখন পরিস্থিতি হতো ভিন্নরূপ। মফঃস্বলে নিজ বাড়িতে বাস করে চাকুরী, ব্যবসা বা অন্যান্য পেশায় যারা নিয়োজিত থাকে তাদের জীবন যাত্রার ব্যয় অনেক কম। অর্থ-বিত্তের জন্য বর্তমানের এই ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা রাজধানীর বাইরে এতো বেশী নয়।

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দ্রুত দারিদ্র বিমোচনের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও শিক্ষাকে বিকেন্দ্রীকরণের কোন বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্যে কেউ কেউ প্রাদেশিক ব্যবস্থার কথা বলে থাকেন। বিষয়টি বাজেটের আওতাভুক্ত নয়। তাছাড়া এ ধরণের ব্যবস্থা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকী বলে অনেকে মনে করেন। তবে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা বহাল রেখেও অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। তার মধ্যে থাকবে রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা, অনুন্নত এলাকায় শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ কর প্রণোদনা, ঋণ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সব থেকে বেশী প্রয়োজন শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি এবং সে জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান। ৫ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে পুলিশের অত্যন্ত ঝুকির চাকুরীতে ঢোকার মত তরুণের অভাব এ দেশে হয় না। এ ধরণের কয়েকজন মিলে নিজেরা একটি মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে পারে। বাজেটে এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

৩. দারিদ্রের শিকল ভেঙ্গে বের হবার সব থেকে শক্তিশালী হাতিয়ার ধরা হয় শিক্ষাকে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। শিক্ষা বিস্তারে বিগত সরকারসমূহের কার্যকর উদ্যোগের কারণে স্বাক্ষরতা বেড়েছে। জোট সরকারের নকল বিরোধী দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে শিক্ষার গুণগত মানেরও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সে শিক্ষা তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তেমন কোন সহায়তা করতে পারছে না। অপরদিকে শিক্ষার অতিমাত্রায় বাণিজ্যিকিকরণের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ভালো মানের শিক্ষার পথ অনেকটাই রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভালো বেতনের বেসরকারী চাকুরীগুলো চলে যাচ্ছে ইংরাজী মাধ্যমে শিক্ষিতদের হাতে। দরিদ্রের জন্য ইংরাজী মাধ্যমের দুয়ার পুরোপুরিই বন্ধ। বন্ধ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাগুলোও। বাংলা মাধ্যমে ভালো ফলাফলের জন্য প্রাইভেট পড়ানোর টাকা দরিদ্ররা কোথা থেকে যোগাবে? তারপর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যুদ্ধেও এগিয়ে থাকে শহুরে ও সচ্ছলেরা। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সবথেকে বেশী অংশগ্রহণ মাদ্রাসাগুলোতে।

মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য সরকারী ও অধিকাংশ বেসরকারী চাকুরীর দরজা বন্ধ। জোট সরকার তার একেবারে শেষ সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষার সমমান দিলেও কোন এক অদৃশ্য কারণে তা এখনও বাস্তবায়িত হয় নি। এ সকল কারণে দরিদ্ররা স্বাক্ষরতা অর্জন করতে পারলেও তা তাদেরকে দারিদ্রের শিকল ভাঙ্গতে তেমন কোন সাহায্য করতে পারছে না।

দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। শিক্ষাকে কেবলমাত্র সার্টিফিকেট পাওয়ার উপায় হিসাবে বিবেচনার পুরানো ধারণা ত্যাগ তার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে কর্মসংস্থানকে। বিশাল জনশক্তির কথা চিন্তা করে আত্ম-কর্মসংস্থানের দিকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সরকার প্রণীত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে কারিগরি শিক্ষাকে জোর দেয়ার কথা বলা হলেও বিগত বাজেট সমূহে এ খাতে বরাদ্দ ছিল অবিশ্বাস্য রকমের কম। ২০০৬-০৭ সালের বাজটে এখাতে বরাদ্দ ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের (৬,১৮৩ কোটি টাকার) পাঁচ শতাংশেরও কম (২৯৭ কোটি টাকা)। অপরদিকে ৫২ শতাংশের কর্মসংস্থান কৃষিতে হলেও কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্টগণের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। নেই কৃষি পণ্য পরিবহণ ও বিপনণের উপরে ধারণা পাবার কোন ব্যবস্থা। নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রচুর সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যেন বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নার্সিং এর মত যে সকল পেশার দেশে ও বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে সে সকল বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করতে হবে। বিদেশে রফতানীকৃত জনশক্তির সিংহভাগ অদক্ষ। তাদের কারিগরি দক্ষতা থাকলে জনশক্তি রফতানী থেকে আমাদের আয় অনেক বেড়ে যেতো। এর পাশাপাশি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন সকল বিষয়ের আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে যেগুলির কর্মসংস্থানের সুযোগ সব থেকে বেশী। এ জন্য উচ্চ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব মাদ্রাসা শিক্ষার সমমান বাস্তবায়ন করতে হবে। এবতেদায়ী মাদ্রাসা, হেফজ খানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহে সাধারণতঃ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানেরা ভর্তি হয় এবং এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বের হবার পর তাদের জীবিকার কোন পথ খোলা থাকে না। তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া গেলে তার সমাজের বোঝা হয়ে না থেকে বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশ নিতে পারবে। ইতোপূর্বে নেয়া এ জাতীয় ছোট ছোট প্রকল্প খুবই সফল হয়েছে।

৪. আমাদের কর ব্যবস্থা দরিদ্রমুখী নয়। এখানে পরোক্ষ কর, যা দরিদ্ররা বেশী দিয়ে থাকে, তার পরিমাণ প্রত্যক্ষ কর যা দিয়ে থাকে ধনীরা, তার থেকে অনেক বেশী। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের কর আদায়ের মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪২,৯১৫ কোটি টাকা যার মধ্যে প্রত্যক্ষ কর ছিল মাত্র ৮,৫০০ কোটি টাকা। একজন রিক্সাচালক কিংবা দরিদ্র কৃষককে তার অজান্তেই ভ্যাট, আমদানী শুল্ক ইত্যাদি পরোক্ষ কর দিতে হচ্ছে জীবন ধারণের নূন্যতম প্রয়োজন মেটাবার জিনিসগুলো কিনতে। অপর দিকে আয়কর ফাঁকি দেয়ার সকল ব্যবস্থাই বর্তমান কর ব্যবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ১৯ লক্ষ টিআইএনধারী রয়েছে, যাদের মধ্যে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করে থাকে মাত্র আট লক্ষের মত। যারা রিটার্ণ দাখিল করেন তাদের সিংহভাগ কর ফাঁকি দিয়ে থাকেন। ড. কামাল হোসেনের মত ব্যক্তিও তার মাসিক আয় দেখান ষাট হাজার টাকা এবং সে অনুযায়ী কর দেন। সরকার কর জরিপের উদ্যোগ নিচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। কাজটি যত দ্রুত সম্ভব শুরু করা প্রয়োজন।

কর ব্যবস্থায় সংস্কার করে প্রত্যক্ষ করের আওতা বাড়ানো এবং তার ফাঁক-ফোকরগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য প্রত্যক্ষ করের হার বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। বরং করযোগ্য আয়ের প্রত্যেক

নাগরিক যেন আয়কর দেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য আয়কর বিষয়ে সচেনতনা সৃষ্টি, কর দাতা জরিপ, আয়কর রিটার্ণ জমা দেবার পদ্ধতিকে সহজীকরণ, আয়কর ব্যবস্থার কম্পিউটারীকরণ ইত্যাদির জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনভূতিকে কাজে লাগানো হলে অকল্পনীয় ফল পাওয়া যেতে পারে। ইসলাম ধর্মে বিধান রয়েছে যে প্রত্যেক সচ্ছল মুসলিম তার সঞ্চিত অর্থের আড়াই শতাংশ যাকাত হিসাবে দরিদ্রকে দিয়ে দিবে। বাংলাদেশে প্রতিবছর কত টাকার জাকাত দেয়া হয় তার কোন সঠিক হিসাব না থাকলেও অনুমান করা হয় যে তা কয়েক হাজার কোটি টাকা হবে। এ অনুমানের পিছনে যুক্তি হচ্ছে যে দেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে যদি ৫০ লক্ষ মানুষ জাকাত দেয় এবং তাদের গড় জাকাতের পরিমাণ যদি দশ হাজার টাকা হয় তাহলে মোট প্রদত্ত জাকাতের পরিমাণ হবে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাকাতের অর্থ অপরিকল্পিতভাবে বন্টন করা হয়, তাতে জাকাত গ্রহীতার কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাকে স্বাবলম্বী করার কোন ব্যবস্থা থাকে না এবং তা দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা রাখে না। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যদি কোন প্রকল্পের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পরিকল্পিত উপায়ে দারিদ্র বিমোচনে ব্যয় করা যায় তাহলে একদিকে যেমন এ অর্থ প্রত্যক্ষ দারিদ্র বিমোচনে ব্যয় করে অতি দ্রুত সময়ে দারিদ্রমুক্তি সম্ভব, তেমনি বিদেশী ঋণের উপর নির্ভরতাও বহুলাংশে কমানো যাবে।

৬. তবে এসকল ব্যবস্থার পরও কিছু মানুষ তাদের বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতার কারণে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে ব্যর্থ হবে। তাদের জন্য বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ব্যবস্থা গত বেশ কয়েক বছরের বাজেটে ক্রমবর্ধমান হারে চলে আসছে। আগামী বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বাড়াতে হবে এবং তাতে জাকাতকে সম্পৃক্ত করতে হবে।